দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষাচিত্র : ২০০৭ সাল

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাগ্রহণের সময় শিক্ষাচিত্রটি কি ছিল? খুব যে আশাব্যঞ্জক ছিল া, তা সহজেই বলা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ াহিদার তুলনায় এতই কম যে, শিক্ষা নিয়ে মাশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। মনিতেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা চ্চ শিক্ষায় বাজেটের যা বরাদ্দ, যা দিয়ে মোটা াপড়ে কোনো রকমে অর্ধে ঢেকে চলা যায়। ভাল কটা কাপড় জোটানো যায় না, দু' তিনটি কেনার তা প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক র্নীতির জন্য সেই অর্ধে রাখাটাও কঠিন হয়ে ড়েছিল। এ সরকার অনেক দুর্নীতিবাজ াজনীতিবিদ, আমলা ও পেশাজীবীকে আদালতের াঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা াপক লুটপাট করেছে, তাদের বলতে গেলে ধরাই য়নি। তারপরও যেসব খবর আমরা কাগজে পড়ছি, াতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না– শিক্ষার মত কটা ক্ষেত্রকে দুর্নীতির এতবড় একটা চারণভূমি ভাবে করে ফেলেছিল। বিগত সরকারগুলি, শেষ করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার! কমুখী শিক্ষার মতো এক অপরীক্ষিত এবং াধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার নামে ৫০০ কোটি কার হরিলুট হল, অথচ লাভ হল অশ্বডিম্ব-এ ষয়টিই বা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? এই সরকার রকম ব্যাপক দুর্নীতির পটভূমিতে ক্ষমতা গ্রহণ রায় শিক্ষা খাতে আশাবাদী হওয়ার সুযোগ তেমন ল না। কিন্তু এ অবস্থার অনেকটাই নিরসন করেছে রকার এবং দুর্নীতিচিত্রটা একটা সহনীয় পর্যায়ে য়ে এসেছে। অবশ্য সরকারের সুবিধা হয়েছে স্কুল লেজের গভর্নিং বডিসহ অন্যান্য সভাতে সরকার লীয় লোকজন তথা রাজনীতিবিদরা না থাকায়, স্কুল লেজের বরাদ্দ নিয়েও ছলচাতুরি না হওয়ায়। ন্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) র এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল বাংলাদেশের ক্ষাখাত হচ্ছে দুর্নীতির শীর্ষে থাকা খাতগুলোর ন্যতম। একমুখী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ এবং বিদেশ কে আনা– টাকা নিয়ে করা দুর্নীতি তার একটি মান্য উদাহরণ মাত্র। এই অবস্থাটা সরকার সামাল য়েছে। একই সঙ্গে একমুখী শিক্ষা শিরোনামে যে পরিণামদর্শী এবং ক্ষতিকর পদ্ধতিটি আগের জনৈতিক সরকার কোমর বেঁধে বাস্তবায়নে মেছিল, তা স্থগিত করেছে। এটিও প্রশংসনীয় কটি উদ্যোগ। অর্থাৎ যে শিক্ষাচিত্র নিয়ে এ সরকার ত্রা শুরু করেছিল তা কয়েক মাসের ব্যবধানে নেকটাই উজ্জ্বল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সরকার ং এর সম্প্রসারণ প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার– না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে সব দলীয় মানুষের নিয়োগ দিয়েছিল, সেগুলোও ই সরকার রদবদল করে। ফলে বেশ কিছু জায়গায় াগ্য মানুষ দায়িত্ব নিতে সক্ষম হন। যদিও অনেক শ্ববিদ্যালয়ে সাবেক জোট সরকার যেসব দলীয় য়োগ দিয়েছিল, সেগুলো মোটামুটি অপরিবর্তিতই কে। তারপরও অবস্থার উন্নতি হয়েছে অথবা পরিবর্তিত রয়েছে– অবনতি অন্ততঃ হয়নি।

কিন্তু আগস্টে এসে শিক্ষাচিত্রটি হঠাৎ একটা নতার সামনে পড়ল। আগস্টের ২০ তারিখ ঢাকা শ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া একটি অপ্রীতিকর ঘটনার র ধরে যে ছাত্র বিক্ষোভ হল, তা হঠাৎ করেই ল হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এটি কম হবার পেছনে ছিল পুলিশী এ্যাকশন। পুলিশ ি এতটা শক্তি নিয়ে ছাত্রদের বিপরীতে না দাঁড়াত হলে বিক্ষোভটা এক-দুদিনেই মিটে যেত। শুরু কেই সরকার ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপারে একটা অনমনীয় অবস্থান নিয়েছিল। শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেয়ার ঘটনাটাও ছিল অপ্রত্যাশিত। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জরুরি আইন ভেঙ্গে মিছিল করেছেন,– এই অভিযোগে তাদের ধরা হল, অথচ জরুরি আইন কয়েক শুক্রবার নিয়মিত ভাঙ্গল কিছু উগ্রবাদী সংগঠন। তাদের কিছু হল না। এসব কারণে ছাত্র-শিক্ষক এবং সরকারের মধ্যে দূরত্ব বাড়ল। রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময় ছাত্রদের আন্দোলন হয়। পুলিশও তাদের ওপর চড়াও হয়। কিন্তু একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এটি হওয়া ছিল অপ্রত্যাশিত। এর অবশ্য কারণও ছিল। ছাত্ররা চেয়েছে দেশে মুক্ত পরিবেশ থাকুক, প্রতিবাদ জানানোর এবং অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়ার সুযোগটা থাকুক। একই সঙ্গে জিনিসপত্রের আকাশ-ছোঁয়া দাম এবং গরীব মানুষের কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে যে অসন্তোষ হয়েছে মানুষের মনে, তার একটা প্রকাশ তারা ঘটাতে চাইল। এটি ছাত্ররা সব সময়ই করে– বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এমনটি হচ্ছে। অথচ সরকার ধরে নিল ছাত্ররা সরকার পতনের আন্দোলন করছে। আমাদের বিশ্বাস, ছাত্রদের বিক্ষোভকে সরকার বুঝতে ভুল করেছে। কিন্তু এর ফলে শিক্ষাচিত্রে যে অস্থিরতা এবং হতাশা দেখা দিয়েছে তা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। যদি ২০০৮ সালের শিক্ষাচিত্রকে উজ্জ্বল এবং যতটা সম্ভব অজটিল করতে হয় এবং এরকম ভাবা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প আমরা দেখছি না তাহলে আগস্টের ঘটনা নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। এ থেকে শেখার যে জিনিসটি আছে তা হল, আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। যে সরকার গণতন্ত্রকে সংহত একটি রূপ দিতে এসেছে রাজনৈতিক সংস্কার সাধন এবং ভবিষ্যতের জন্য রাজনীতিকে স্বচ্ছ, কালো টাকা ও পেশি শক্তি থেকে মুক্ত করতে এসেছে, সে সরকার নিজেকে সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক প্রমাণ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নতুন নেতৃত্বে এখন যথেষ্ট গতিশীল, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ এখনও তেমন শুরু হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন দলীয় রাজনীতি থেকে বেশ কিছুটা মুক্ত, অন্ততঃ আগে যেমন নগ্নভাবে দলীয় হস্তক্ষেপ হত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদিতে, এখন সেরকম হচ্ছে না। তারপরও এই রাজনীতি নিরপেক্ষতা বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক একটি রূপ দিতে হবে।

আমাদের প্রত্যাশা, অভিদ্রুত ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের বিষয়টির একটি সম্মানজনক সমাধান করে সরকার ২০০৮ সালের শিক্ষাচিত্রটি অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের চিত্রের মতো অমলিন রাখতে কাজে নেমে পড়বে।

২. একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত রাখার পাশাপাশি সরকার যে প্রশংসনীয় উদ্যোগটি নিয়েছিল তা ছিল পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বিকৃতি রোধ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা। ইতিমধ্যে এ কাজটি শেষ হয়েছে অথবা হওয়ার পথে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ইতিহাসকে নিজেদের মতো করে লিখেছে, বিশেষ করে বিএনপি-জামাত জোট সরকার। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এক কথা বলে; আর জোটের মনগড়া ইতিহাস অন্য কথা বলে। জোট সরকারের পাঁচ বছর ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ইচ্ছেমতো বিকৃতির এক নিরবচ্ছিন্ন উৎসব। এতে সামিল দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামী, যাদের অনেক নেতাই রাজাকার, আলবদর এবং আল-শামস বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এখন ইতিহাসের সত্যগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠার পথটিও প্রশস্ত হল।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়াটা একটা বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পাঠ্যপুস্তকে ভুলভ্রান্তি পাঠ্যপুস্তকের ছাপা ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে মানের অভাব– এসব নিয়ে অভিযোগও অনেক পুরনো। এ সরকার এ সমস্যাগুলির সমাধানে কাজ করছে। একই সঙ্গে কাগজে দেখেছি, সরকার নোটবইয়ের দৌরাত্ম্য কমানোর বা নির্মূলের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছে। নোটবই শিক্ষার মান নামিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় এবং ক্ষতিকর প্রভাব রাখছে। যদিও এর জন্য দায়ী স্কুলগুলোতে মানসম্মত শিক্ষার অভাব, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা। আরো কিছু কারণ হয়তো রয়েছে; কিন্তু এগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমাধান দুরূহ বলেই মনে হয়, সমাধান-অসম্ভব না হলেও। তাই বলে নোটবই যদি পাঠ্যবইয়ের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়ও, তাওতো মেনে নেয়া যায় না। নোটবই নির্মূল করার জন্য এখনি পদক্ষেপ নিতে হবে এবং একই সঙ্গে শিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, এসব বিষয়েও সরকারকে মনোযোগী হতে হবে। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় এবং এর চেয়ারম্যান একটি অনুষ্ঠানে আমাকে জানিয়েছেন, ২০১০ সালের মধ্যে মুখস্থ বিদ্যা এবং নোটবই নির্ভরতা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে পারা যাবে, এ বিষয়ে তিনি প্রত্যয়ী। তার প্রত্যয় প্রশংসনীয় এবং আমরা সকলেই আশা করি, এক্ষেত্রে আমরা সফল হব। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, পদায়ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার এখনই উদ্যোগী না হলে এক্ষেত্রে সাফল্য আসবে না। ২০০৭ সালে অন্তত এক্ষেত্রে সরকারের ব্যাপক কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। ২০০৮ সালের শুরু থেকেই এই উদ্যোগ বড় আকারে শুরু হবে, আমাদের আশাবাদ তাই।

৩. আমাদের দেশে শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে গেলে, শ্রীলঙ্কা বা ভারতের কেরালা রাজ্যের মতো প্রায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। অথচ এই খাতটি আমাদের দেশে এখনও অবহেলিত। শিক্ষা নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে দেশে। যত গোলটেবিল হয়েছে, তার কতভাগ উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালগুলিকে নিয়ে, আর কতভাগ প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ে, তার একটা হিসাব নিলেও এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। ২০০৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকলে এক্ষেত্রে কাজ করা সহজ হবে। প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষকদের বেতন ভাতা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াতে হবে। স্কুলগুলোর ভৌত এবং শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, স্কুলগুলোতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই করার তালিকার শেষ নেই। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা, এ জন্য নিষ্ঠা, আগ্রহ, উদ্যোগ– সবই থাকতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলো নিয়েও ভাবতে হবে। মেয়েদের জন্য স্কুলগুলোতে সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে পড়েছিলাম, স্কুলগুলোতে মেয়েদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় বহু মেয়ের পক্ষে স্কুলে আসা সম্ভব হয় না। এটি ভাবার বিষয়। দুটো টয়লেট বানাতে কত টাকা বিনিয়োগ হয় এবং কুড়ি বাইশটি মেয়ে শিক্ষা না পেলে জাতির কত ক্ষতি হয় এরকম হিসাব করলে সহজেই বেরিয়ে আসে এসব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার অনিবার্যতা।

আমি দেখেছি, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য-কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলি একটি টিভি নাটকের জন্য তিন লাখ টাকা দিচ্ছে, গানের কনসার্ট করার জন্য দিচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা, গলফ খেলার স্পন্সরশিপ দিচ্ছে বিশ লাখ টাকা। এসব খরচে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আরো ভাল খরচ হয়, যদি দেশের সকল স্কুলে এসব প্রতিষ্ঠান মিলে একটা করে গ্রন্থাগার, দু-চারটি টয়লেট এবং কিছু বেঞ্চ, কম্পিউটার ইত্যাদি কিনে দেয়। বিদেশে শিক্ষা খাতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোও সক্রিয়। আমাদের দেশে কেন হবে না? স্কুল কলেজগুলোতে মেয়েদের (এবং ছেলেদের) হোস্টেল তৈরিতে তারা কেন এগিয়ে আসবে না? আর দেশের নানা নাগরিক সংস্থা (ফেনী সমিতি, হবিগঞ্জ সমিতি বা বরগুনা সমিতি) কেন 'এডপ্ট এ স্কুল' বা 'একটি স্কুলকে দত্তক নিন' এই শ্লোগান নিয়ে অন্ততঃ একটি স্কুলের খরচাপাতি গ্রন্থাগার ইত্যাদির দায়িত্ব নেবে না?

২০০৮ সালে এমনটি শুরু হলে ২০১৮ সালের মধ্যে এ দেশটির চেহারা একেবারে পাল্টে যাবে।

৪. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নতুন নেতৃত্বে এখন যথেষ্ট গতিশীল, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ এখনও তেমন শুরু হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন দলীয় রাজনীতি থেকে বেশ কিছুটা মুক্ত, অন্ততঃ আগে যেমন নগ্নভাবে দলীয় হস্তক্ষেপ হত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদিতে, এখন সেরকম হচ্ছে না। তারপরও এই রাজনীতি নিরপেক্ষতা বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক একটি রূপ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য প্রমুখকে নিয়োগ দেয়ার জন্য একটি সার্চ কমিটি করেছিল সরকার। এটি একটি ভাল উদ্যোগ তবে এর প্রধান দেশের বরেণ্য একজন শিক্ষাবিদকে করলে বিষয়টি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হত। উদ্যোগটি যেহেতু শুরু হয়েছে, তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনাটা কঠিন হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি আমরা সবাই চাই। কিন্তু এদের স্বায়ত্তশাসিত চরিত্র যেন কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়, তা দেখতে হবে।

৫. বছরের শেষে এসে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসন প্রয়োজন। এজন্য দরকার হলে অন্যান্য খাতে ব্যয় সাশ্রয় করে হলেও অর্থের সংস্থান করতে হবে। একটি দুর্যোগে যদি দেশের হাজার হাজার শিশুর জন্য শিক্ষাপ্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তা হবে আরো বেশি বিপর্যয়কারী এবং দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ।

[লেখক: কথাশিল্পী ও শিক্ষাবিদ]